রেসালাত

ও

আখেরাত

তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিবেকের ফায়সালা

বড় বড় শহর-নগরে আমরা দেখতে পাই, শত শত কারখানা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলছে। রেল ও ট্রাম-গাড়ী তীব্রভাবে ধাবমান। সন্ধ্যার সময় হাজার হাজার বিজলী বাতি জ্বলে উঠে, গ্রীষ্মকালে প্রায় ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা চলে। কিন্তু এতসব কাজ দেখে আমাদের মনে যেমন কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, তেমনি এসব জিনিস উজ্জ্বল ও তীব্র গতিসম্পন্ন হওয়ার মূল কারণ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনোরূপ মতবৈষম্যেরও সৃষ্টি হয় না। এর কারণ কি ?

এর একমাত্র কারণ এই যে, যে বৈদ্যুতিক তারের সাথে এ বাতিগুলো যুক্ত রয়েছে, তা আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই। যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে এ তারগুলো সংযোজিত, তার অবস্থাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যারা কাজ করে, তাদের অস্তিত্ব এবং বর্তমান থাকাও আমাদের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কর্মচারীদের উপর যে ইঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত রয়েছে সে-ও আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা একথাও জানি যে, এ ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

তার নিকট বিরাট যন্ত্র রয়েছে। এ যন্ত্র চালিয়ে সে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। বিজলী বাতির আলো, পাখার ঘূর্ণন, রেল ও ট্রাম-গাড়ীর দ্রুত গমন, চাকা ও কারখানা চলা ইত্যাদির মধ্যেই আমরা সেই বিদ্যুৎ শক্তির অস্তিত্ব বাস্তবভাবে দেখতে পাই। কাজেই বিদ্যুৎ শক্তির ক্রিয়া ও বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেখে তার কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোনো মতবৈষম্যের সৃষ্টি না হওয়ার কারণ কেবল এটাই যে, এ কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রটিই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূত এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের গোচরীভূত রয়েছে। মনে করুন, এ বিজলী বাতিগুলো যদি জালান হতো ; পাখাগুলো ঘুরতো, রেল ও ট্রাম-গাড়িগুলো দ্রুত চলতো, চাকা ও যন্ত্র দানব গতিশীল হতো। কিন্তু যে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁছায় তা যদি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যেতো, বিদ্যুৎ কেন্দ্রও অনুভূতি শক্তির আয়ত্বের বাইরে থাকতো, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমরা যদি কিছুই জানতে না পারতাম এবং কোন্ ইঞ্জিনিয়ার নিজের জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে এ কারখানাটি পরিচালনা করছে, একথাও

না জানতাম তা হলেও কি আমরা এমনিভাবে শান্ত মনে বসে থাকতে পারতাম ? তখন কি বৈদ্যুতিক শক্তির এ বাহ্যিক কার্যক্রম দেখে তার মূল কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হতো না ? এর উত্তরে সকলেই বলবেন, তখন আমাদের মধ্যে মতবৈষম্য না হয়ে পারতো না। কিন্তু কেন ?

এজন্য যে, বাহ্যিক কার্যক্রমের কারণ যখন প্রচ্ছন্ন অগোচরীভূত ও অজ্ঞাত, তখন আমাদের মনে বিস্ময়সূচক অস্থিরতার উদ্রেক হওয়া এ অজ্ঞাত রহস্যের দারোদ্ঘাটনের জন্য উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হওয়া এবং রহস্য সম্পর্কে ধারণা-অনুমান ও মতের পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

একথাটি ধরে নেয়ার পর আরো কয়েকটি কথা চিন্তা করুন। মনে করুন উপরে যে কথাগুলো ধরে নেয়া হয়েছে, তাই বাস্তব জগতে বিদ্যমান। সহস্র-লক্ষ বিজলী বাতি জ্বলছে, লক্ষ পাখা অহর্নিশ ঘুরছে, অসংখ্য গাড়ী দ্রুত দৌড়াচ্ছে, শত সহস্র কারখানা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। কিন্তু এগুলোতে কোন্ শক্তি কাজ করছে এবং সেই শক্তিই বা কোথা হতে আসে, তা জানার কোনো উপায়ই আমাদের করায়ত্ব নয়, এসব কর্মকাণ্ড ও বাহ্যিক লক্ষণ-নিদর্শন দেখে লোকদের মন হতচকিত ও স্তম্ভিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মকারণের সন্ধানে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। কেউ বলছে ঃ এ সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজ্জ্বল আলোক মণ্ডিত এবং স্বীয় শক্তি বলে চলমান, গতিশীল। এগুলোর নিজস্ব সত্ত্বার বাইরে এমন কোনো শক্তি নেই যে, এগুলোকে আলো বা গতি দান করতে পারে। কেউ বলছে ঃ এসব জিনিস যেসব বস্তু হতে সৃষ্ট সেগুলোর সংযোজন ও সংগঠনই তাদের মধ্যে আলো ও গতির উদ্ভব করেছে। অন্য কারো মতে এ বস্তুজগতের বাইরে কতক দেবতা রয়েছে, যাদের মধ্য হতে কেউ বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত করে, কেউ ট্রাম-রেলগাড়ী চালায়, কেউ পাখাগুলোতে ঘূর্ণন ও আবর্তন ঘটায় এবং কারখানা ও যন্ত্রের চাকাকে গতিশীল করে। অনেক লোকে আবার এ বিষয়টি চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাতর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্যাবৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আমরা শুধু এতটুকু জানতে পারি যতটুকু আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই ও অনুভব করতে পারি। তার অধিক কিছু আমরা বুঝতে পারি না। আর যা আমাদের বোধগম্য নয়, আমরা তার সত্যতাও যেমন স্বীকার করতে পারি না, তেমনি পারি না তাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে।

এসব লোক পরস্পরের সাথে লড়াই-ঝগড়া করে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো নিকট নিজস্ব চিন্তা ও মতের সমর্থনে এবং অপরের চিন্তা ও মতের প্রতিবাদ করার জন্য নিছক ধারণা-অনুমান ছাড়া নির্দিষ্ট ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞান বলতে কিছুই নেই।

এসব মতবিরোধ ও মতবৈষম্য চলাকালে এক ব্যক্তি এসে বলে ঃ সঠিক জ্ঞানের এমন একটি সূত্র আমার নিকট আছে, যা তোমাদের কারো কাছে নেই। আমি জানতে পেরেছি যে, এসব বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, গাড়ী, কারখানা ও যন্ত্রের চাকা এমন কতকগুলো প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম তারের সাথে সংযুক্ত, যা তোমরা (কেউ) দেখতে পাও না, অনুভবও করতে পারো না। একটি বিরাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Power House) হতে এসব তারে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাই আলো ও গতিরূপে তোমাদের সামনে অভিব্যক্ত হয়। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বড় বড় যন্ত্র সংস্থাপিত রয়েছে, যাকে অসংখ্য ব্যক্তি চালাচ্ছে। এ ব্যক্তিগণ আবার একজন ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে এবং এ ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞান ও শক্তিই এ সমগ্র ব্যবস্থাকে কায়েম করেছে, তারই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এ ব্যক্তি পূর্ণ শক্তিতে তার উপরোক্ত দাবী পেশ করে। লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। সকল দল এক যোগে তার বিরোধিতা করে। তাকে পাগল বলে, আঘাত করে, মারপিট করে, কষ্ট দেয়, ঘর হতে বের করে দেয়। কিন্তু এসব অমানুষিক ও দৈহিক উৎপীড়ন সত্ত্বেও সে নিজের দাবীর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি কিংবা প্রলোভনে পড়ে নিজের মূল কথার এক বিন্দু পরিমাণ রদবদল বা সংশোধন করতে প্রস্তুত হয় না। কোনো প্রকার বিপদেও তার দাবীতে কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না। উপরন্তু তার প্রত্যেকটি কথাই প্রমাণ করে যে, তার কথার সত্যতার উপর তার দৃঢ় প্রত্যয় বিদ্যমান।

এরপর আর এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। সে-ও ঠিক একথাই অনুরূপ দাবী সহকারে পেশ করে। তার পর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ব্যক্তি এসেও পূর্ববর্তীদের মতোই কথা বলে নিজের দাবী উপস্থিত করে। অতপর এ ধরনের লোকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এমনকি তাদের সংখ্যা শত সহস্রকেও অতিক্রম করে যায়, আর এসব লোকই সেই এক প্রকারের কথাকে এ ধরনের দাবী সহকারে উপস্থাপন করে। স্থান কাল ও অবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মূল কথায় কোনোই পার্থক্য সূচিত হয় না। সকলেই বলে ঃ আমাদের কাছে জ্ঞানের এমন এক বিশেষ সূত্র বিদ্যমান,

যা অপর কারো কাছে নেই। এ সকল লোককে সমানভাবে পাগল বলে আখ্যা দেয়া হয়। সকল প্রকার নির্যাতন-নিষ্পেষণে তাদেরকে জর্জরিত করে তোলা হয়। সকল দিক দিয়েই তাদেরকে কোণঠাসা ও নিরুপায় করে দেবার চেষ্টা করা হয়। তাদের কথা ও দাবী হতে তাদেরকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু তাদের সকলেই নিজের কথার উপর অচল অটল হয়ে থাকে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান পর্যন্ত সরাতে পারে না। এ সংকল্প, দৃঢ়তা ও স্থির সততার সাথে তাদের বিশেষ কতগুলো গুণের ও বৈশিষ্ট্যের সংযোগ হয়। তাদের মধ্যে একজনও মিথ্যাবাদী, চোর, বিশ্বাস ভংগকারী, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ও হারামখোর নয়। তাদের শত্রু এবং বিরোধীরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই লোকদের চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র, স্বভাব অতিশয় নির্মল ও পুণ্যময়। নৈতিক সৌন্দর্য ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এরা অপর লোকদের তুলনায় উন্নত এবং বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ ছাড়া তাদের মধ্যে পাগলামীরও কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। বরং তার বিপরীত—চরিত্র সংশোধন ও মন পরিশুদ্ধকরণ এবং বৈষয়িক কায়-কারবারগুলোর সংশোধন সম্পর্কে এমন সব উন্নত শিক্ষা তারা পেশ করে—এমন সব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি রচনা করে, যারা সমান আইন রচনা করা তো দূরের কথা, তার সূক্ষ্মতা অনুধাবন করার জন্যও বড় বড় পণ্ডিত মনীষীগণকে গোটা জীবন অতিবাহিত করে দিতে হয়।

একদিকে সেই বিভিন্ন চিন্তা ও মতের লোক—যারা এই লোকদের কথাকে মিথ্যা মনে করছে, এর সত্যতা অস্বীকার করছে, আর অপর দিকে রয়েছে এ ঐকমত্য পোষণকারী দাবীদারগণ। এ উভয়েরই ব্যাপারটি সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধির আদালতে বিচার মীমাংসার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়। বিচারক হিসাবে বুদ্ধির কর্তব্য হচ্ছে প্রথমত স্বীয় অবস্থাকে খুব ভালো করে বুঝে নেয়া ও যাচাই করা। তার কর্তব্য পক্ষদ্বয়ের অবস্থাকে তুলনামূলকভাবে অনুধাবন করা এবং উভয়ের মধ্যে তুলনা ও যাচাই পরখ করার পর কারো কথা গ্রহণযোগ্য তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিচারকের বিবেকের অবস্থা এই যে, প্রকৃত ব্যাপারটিকে সঠিক রূপে জেনে নেবার কোনো সূত্রই তার করায়ত্ব নয়। প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের (Ultimate Reality) কোনো জ্ঞানই তার নেই। তার সামনে পক্ষদ্বয়ের বর্ণনা-বিবৃতি, যুক্তি-প্রমাণ, তাদের নিজস্ব অবস্থা ও বাহ্যিক লক্ষণ নিদর্শনই শুধু বর্তমান। তাকে গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে যাচাই করে সম্ভাব্য অধিক সত্য হতে পারে কে—তার ফায়সালা করতে হবে। কিন্তু

সাম্ভাব্য অধিক সত্য হওয়ার দৃষ্টিতেও তা কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে না। কেননা যা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য তার করায়ত্ব তার ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তা বলাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। খুব বেশী হলে তার পক্ষে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার দান করা সম্ভব। কিন্তু পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে কাউকে সত্য বলা বা কাউকেও মিথ্যা বলে অভিহিত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

যারা উক্ত কথা ও দাবীর সত্যতা অস্বীকার করে তাদের অবস্থা এরূপঃ

এক ঃ প্রকৃত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে তাদের মতাদর্শ বিভিন্ন। কোনো একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবৈষম্য দেখতে পাওয়া গেছে।

দুই ঃ তারা নিজেরাই একথা বলে যে, প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান-সূত্রও তাদের মধ্যে বর্তমান নেই। তাদের মধ্যে কোনো কোনো দল শুধু এতটুকু মাত্র দাবী করে যে, তাদের আন্দায-অনুমান অপর লোকদের আন্দায-অনুমানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এছাড়া আর কোনো জিনিসেরই তাদের কোনো দাবী নেই। কিন্তু তাদের ধারণা-অনুমানগুলো যে নিছক ধারণা অনুমানই–এর বেশী কিছু নয়, সে কথাও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করে।

তিন ঃ তাদের ধারণা-অনুমানের উপর তাদের বিশ্বাস, ঈমান ও প্রত্যয় অটল দৃঢ়তা পর্যন্ত পৌঁছেনি, মত পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্তও তাদের মধ্যে বর্তমান। অনেক সময় দেখা গেছে যে, এক একজন ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে মত পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে পোষণ ও প্রচার করতো পরের দিনই সে তার পুরাতন মতের প্রতিবাদ ও এক নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেছে। বয়স, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে প্রায়ই তাদের মত পরিবর্তিত হয়, তা এক প্রমাণিত সত্য।

চার ঃ উপরোক্ত কথা অস্বীকারাকারীদের কাছে একথাকে অস্বীকার করার স্বপক্ষে এতটুকু মাত্র যুক্তি রয়েছে যে, তারা নিজেদের কথার সত্যতার অনুকূল কোনো সন্দেহমুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তার সেই গোপন 'তার' তাদেরকে দেখায়নি যার সাথে এ বিজলী বাতি ও পাখা ইত্যাদি যুক্ত রয়েছে বলে তারা দাবী করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষকগণের মাধ্যমে বিদ্যুতের অস্তিত্বও তাদেরকে দেখানো হয়নি। বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিভ্রমণেরও কোনো ব্যবস্থা করেনি, এর কল-

কারখানা এবং যন্ত্রও দেখায়নি। সেখানকার কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত হয়নি, ইঞ্জিনিয়ারের সাথেও কখনো সাক্ষাত করায়নি। এমতাবস্থায় এগুলোর অস্তিত্ব ও সত্যতাকে আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি।

যারা উক্ত কথার দাবী পেশ করছে তাদের অবস্থা এরূপ ঃ

এক ঃ একথার দাবী যারা পেশ করেছে তারা সকলেই সর্বোতভাবে একমত। মূল দাবীর অন্তর্নিহিত যত নিগূঢ় কথা ও দিক তার সব বিষয়েই তাদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

দুই ঃ তাদের সকলেরই সর্বসম্মত ঐক্যবদ্ধ দাবী এই যে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞানের এমন একটি সূত্র রয়েছে, যা সাধারণ লোকদের আয়ত্বাধীন নয়।

তিন ঃ তাদের মধ্যে একথা কেউ বলেনি যে, তারা একথা শুধু ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে বলছে এবং সকলেই পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে একথা বলছে যে, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তার কর্মচারীগণ তাদের নিকট আসা যাওয়া করে, তার কারখানা পরিভ্রমণেও তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবং তারা যা কিছু বলে, তা সন্দেহমুক্ত জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারেই বলে, ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে নয়।

চার ঃ তাদের মধ্যে কেউ নিজের কথা ও দাবীতে বিন্দু পরিমাণও রদ-বদল করেছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও পেশ করা যেতে পারে না। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের সূচনা হতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একই কথা বলেছেন।

পাঁচ ঃ তাদের চরিত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে পবিত্র। মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা শঠতা, দাগাবাযীর বিন্দু পরিমাণ সম্পর্কও তাদের চরিত্রে নেই। আর জীবনের সমগ্র ব্যাপারে তারা সত্যনিষ্ঠ ও খাঁটি, তারা এ ব্যাপারে সকলে মিলে যে মিথ্যা বলবে এর যুক্তিগত কারণ কিছুই নেই।

ছয় ঃ এরূপ দাবী করে তারা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে—এরূপ কোনো প্রমাণও পেশ করা যেতে পারে না। বরং বিপরীত এ অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, তাদের অধিকাংশ এ দাবীর কারণে অমানুষিক কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছে, সম্মুখীন হয়েছে কঠিন বিপদ-মুসিবতের। সে জন্য তারা দৈহিক কষ্ট ভোগ করেছে, কারারুদ্ধ হয়েছে, আহত ও প্রহৃত হয়েছে, দেশ হতে নির্বাসিত ও বহিষ্কৃত হয়েছে। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। এমনকি কাউকে কাউকে করাত দ্বারা দু

টুকরা করা হয়েছে। কয়েকজন ছাড়া কারো পক্ষেই সচ্ছল ও সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এ কাজের পশ্চাতে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত রয়েছে, এরূপ অভিযোগ আরোপ করা যায় না। বরং এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় নিজের কথা ও দাবীর উপর অচল-অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাদের সত্যতা সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল—এমন বিশ্বাস ও আস্থা যে, নিজের প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যেও তাদের কেউ নিজ দাবী প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত হয়নি।

সাত ঃ তারা পাগল–বুদ্ধি বিবর্জিত ছিল বলেও কোনো প্রমাণ নেই। জীবনের সমগ্র ব্যাপারে তারা সকলেই চূড়ান্ত পর্যায়ের বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন প্রমাণিত হয়েছে। তাদের বিরোধীরাও প্রায়ই তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিশেষ ব্যাপারে তাদের পাগল বলে কিরূপে বিশ্বাস করা যেতে পারে ? বিশেষত এ ব্যাপারটি যে কি, তাও চিন্তা করা আবশ্যক ? এ বিষয়টি তাদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এরই জন্য তারা সারা দুনিয়ার মুকাবিলা করতেও প্রস্তুত হয়েছিল। এরই জন্য তারা বছরের পর বছর ধরে দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। সেটাই ছিল তাদের বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার মূলনীতি। যার বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কথা বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

আট ঃ তারা নিজেরাও এটা বলেনি যে, আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার বা সেখানকার কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত করাতে পারি। কিংবা তার গোপন কারখানাও দেখাতে পারি। অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আমাদের দাবীর যথার্থতাও প্রমাণ করতে পারি। তারা নিজেরা এ সমস্ত বিষয়কে 'অদৃশ্য' বলেই অভিহিত করে। তারা বলে ঃ তোমরা আমাদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আমরা যা কিছু বলছি, তা মেনে নেও।

পক্ষদ্বয়ের আস্থা ও উভয়ের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করার পর বুদ্ধির আদালত স্বীয় ফায়সালা করছে ঃ

বুদ্ধি বলে কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণ, নিদর্শন ও দর্শনে ওগুলোর আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ অনুসন্ধান কাজ উভয় পক্ষই করেছে এবং উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশ করেছে। বাহ্যদৃষ্টে উভয় পক্ষের মতবাদ একটি দিক দিয়ে সমান ও 'একই রকম' মনে হয়। প্রথমত উভয় পক্ষের

কারো মতে বুদ্ধির বিচারে 'অসম্ভবতা' নেই। অর্থাৎ বুদ্ধির নিয়ম-নীতির দৃষ্টিতে কোনো একটি মত সম্প্রর্কে একথা বলা যায় না যে, তার নির্ভুল ও সত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত উভয় পক্ষের কারো কথায় সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তব অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। প্রথম পক্ষের লোকেরাও যেমন নিজেদের সমর্থনে না এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ হয়েছে, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে। তেমনি দ্বিতীয় পক্ষও না এরূপ প্রমাণ পেশ করতে সমর্থ, না এরূপ প্রমাণ করার দাবী করে। কিন্তু আরো অধিক চিন্তা ও গবেষণার পর এমন কয়েকটি বিষয় সুপ্রতিভাত হয়ে উঠে এবং তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের 'মতবাদ' অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

প্রথম ঃ অপর কোনো মতবাদের স্বপক্ষে ও সমর্থনে এত বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিমান, পবিত্র স্বভাব-চরিত্র সম্পন্ন, সত্যবাদী লোক এক কথায় এতো জোরালোভাবে, এত দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় সহকারে প্রচার ও সমর্থন করেনি।

দ্বিতীয় ঃ এরূপ স্বভাবের লোকেরাও বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন স্থানের। এরা সম্মিলিতভাবে দাবী করেছে যে, তাদের সকলেরই নিকট এক অসাধারণ জ্ঞান-সূত্র বিদ্ধমান এবং তারা সকলেই এই সূত্রের মাধ্যমে বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ জানতে পেরেছে। কেবলমাত্র এতটুকু জিনিসই আমাদেরকে তাদের দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষভাবে এ কারণে যে, তাদের জ্ঞান তথ্য সম্পর্কে তাদের পরস্পরের বর্ণনার মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যাকিছু জ্ঞান-তথ্যের কথা তারা প্রকাশ করেছে, তাতে বুদ্ধিগত অসম্ভবতাও কিছু নেই। কোনো লোকের মধ্যে কিছু অনন্য সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি বর্তমান থাকা যা অপর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না—বুদ্ধির বিচারে অসম্ভব মনে করারও কোনো কারণ নেই।

তৃতীয় ঃ বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের অবস্থা চিন্তা করলেও এটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদই ঠিক। কেননা বিজলী বাতি, পাখা, গাড়ী, কারখানা ইত্যাদি স্বতই উজ্জ্বল ও গতিশীল হতে পারে না। এরূপ হলে উজ্জ্বল ও গতিশীল হওয়া তাদের নিজস্ব ইখতিয়ারভুক্ত হতো। আর তা যে নয়, বলাই বাহুল্য। অনুরূপভাবে তাদের আলো ও গতি তাদের বস্তুগত সংগঠনেরও ফল নয়। কেননা তা যখন গতিশীল ও

উজ্জ্বল হয় না তখনও তো তাদের বস্তুগত সংগঠন এরূপ বর্তমান থাকে। আর এসব বিভিন্ন শক্তির অধীনও নয়, তাও সুস্পষ্ট। কেননা বাতিসমূহের যখন আলো থাকে না, তখন পাখাও বন্ধ থাকে, ট্রাম-গাড়ীও বন্ধ হয়ে যায়, কারখানাও তখন চলে না, এটা সচরাচরই পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ দানে প্রথম পক্ষের তরফ হতে যেসব মতবাদ পেশ করা হয়েছে, তা সবই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিচারের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য।

সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল কথা এটাই মনে হয় যে, এ সমস্ত নিদর্শনেই একটি শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং তার মূলমন্ত্র এক 'সুবিজ্ঞ শক্তিমান ও বুদ্ধিমান' সত্ত্বার হাতে নিবন্ধ, তিনি এক 'সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা' অনুযায়ী এ শক্তিকে বিভিন্ন নিদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যয় করছেন।

তবে সংশয়বাদীরা বলে থাকে যে, একথা আমাদের বোধগম্য হয় না, আমরা তাকে না সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি আর না মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি। বিচার-বুদ্ধি একথাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারে না। কেননা, কোনো একটি কথার বাস্তবে সত্য হওয়া তার শ্রোতাদের বোধগম্য হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য বিপুল সাক্ষ্য হওয়াই তার বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। আমাদের নিকট কয়েকজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক যদি বলে যে, আমরা পশ্চিম দেশে লোকদেরকে লৌহ নির্মিত গাড়ীতে বসে শূন্যলোকে উড়তে দেখেছি এবং লণ্ডনে বসে আমাদের নিজেদের কানে আমেরিকার বক্তৃতা শুনে এসেছি, তবে আমরা শুধু দেখবো যে, এ লোকগুলো মিথ্যাবাদী বা বিদ্রূপকারী তো নয়? এরূপ বলার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ তো কিছু জড়িত নেই? আমরা যদি দেখি যে, বহুসংখ্যক সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান লোক কোনোরূপ মতদ্বৈততা ছাড়াই এবং পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে একথা বলছে, তাহলে আমরা পূর্ণ প্রত্যয় সহকারে তা অবশ্যই মেনে নিবো। লৌহ নির্মিত গাড়ীর শূন্যলোকে উড়ে যাওয়া এবং কোনো প্রকার বস্তুগত মাধ্যম ছাড়াই এক দেশের ধ্বনি কয়েক সহস্র মাইল দূরবর্তী কোনো দেশে শ্রুত হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য না হলেও তা আমরা বিশ্বাস করবো।

আলোচ্য 'মামলায়' বুদ্ধির ফায়সালা এটাই। কিন্তু মনের সত্য বিশ্বাস ও প্রত্যয়মূলক অবস্থা—ইসলামী পরিভাষায় যাকে ঈমান বলা হয়—এরূপ ফায়সালা হতে লাভ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক

নিষ্ঠাপূর্ণ অনুভূতি, দরকার মন লাগিয়ে দেয়ার, সেজন্য হৃদয়ের অভ্যন্তরের গভীর মর্মমূল হতে এক ধ্বনি উত্থিত হওয়ার প্রয়োজন যা মিথ্যা, সংশয়, সন্দেহ ও ইতস্তত করার সকল অবস্থার চির অবসান করে দিবে। পরিষ্কার বলে দিবে, লোকদের ধারণা-অনুমান, চিন্তা-কল্পনা ভুল বাতিল। সত্যবাদী লোকেরা যা আন্দায করে নেয়—নির্ভুল জ্ঞান ও অনাবিল অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে তাই সত্য, তা-ই নির্ভুল।

বিবেকের বিচারে মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়াত

কিছুক্ষণের জন্য চর্ম চক্ষু বন্ধ করে কল্পনার দৃষ্টি উন্মোচন করুন এবং এক হাজার চারশত বছর পিছনের দুনিয়ার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ! ভেবে দেখুন, এটা কি রকমের জগত ছিল। মানুষের পারস্পরিক চিন্তার আদান-প্রদানের উপায়-উপাদান তখন কতইনা কম ছিল। জাতি ও দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সুবিধা কতইনা সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের জ্ঞান ছিল কতো সামান্য। চিন্তা ও মানসিকতা ছিল কতইনা সংকীর্ণ। চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল কুসংস্কার ও বর্বতার কি দৌর্দণ্ড প্রভাব। মূর্খতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো ছিল কতইনা ম্লান ও অনুজ্জ্বল, আর এ সমাচ্ছন্ন অন্ধকারকে অপসারিত করে কতইনা কষ্ট সহকারে তা বিস্তার লাভ করছিলো। তখনকার দুনিয়ায় ছিল না তারবার্তার ব্যবস্থা, ছিল না কোনো টেলিফোন, ছিল না রেডিও, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজ। কোথাও ছিল না মুদ্রণ যন্ত্র ও প্রকাশনালয়। ছিল না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের কোনো আধিক্য ও প্রাচুর্য। তখন কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হতো না, না লিখিত ও প্রচারিত হতো বিপুল সংখ্যায় বই-পুস্তক। সেই যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তির জ্ঞানও অনেক দিক দিয়ে বর্তমান যুগের একজন সাধারণ লোকের তুলনায় ছিলো অতি সামান্য। সেকালের উচ্চ সমাজের এক ব্যক্তিও বর্তমান যুগের এক মজুর-শ্রমিক অপেক্ষাও ছিল কম সভ্যতা মণ্ডিত। ঐ সময়ের একজন উন্নত শিক্ষিত ব্যক্তি একালের এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। আজ যে কথা ছোট-বড় সকলেই জানে, সেকালে তা কয়েক বছরকালীন অবিশ্রান্ত শ্রম-মেহনত, অনুসন্ধান ও গবেষণার পরও জানা কঠিন ছিল। যেসব জ্ঞান বর্তমানে আলোর মতো সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং যা প্রত্যেকটি বালক পর্যন্ত চৈতন্যোদয় হওয়ার সাথে সাথেই জানতে পারে, অনুরূপ জ্ঞানের জন্য সেকালে শত সহস্র মাইল পথ সফর করতে হতো। এর অনুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করে দেয়া হতো। আজ যেসব কথা ও চিন্তাকে কুসংস্কার বলে আখ্যা দেয়া হয়, সেকালে তাই ছিল গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে যেসব কাজ অবাঞ্ছনীয় বর্বরতামূলক বলে বিবেচিত হয়, সেকালে তা ছিল লোকদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। যেসব উপায় ও পন্থাকে আজ মানুষের মন ঘৃণা করে, সেকালের নৈতিকতায় তা কেবল বৈধই ছিলো না, তার বিপরীতও কোনো

পন্থা বা উপায় হতে পারে তা ছিল নিতান্ত ধারণাতীত। বিস্ময়কর জিনিসের প্রতি সেকালের লোকদের মনে আকর্ষণ ছিল সীমাতিরিক্ত। অতি-প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ না হলে সেকালে কোনো জি নিসই সত্য, মহান ও পবিত্র বলে স্বীকৃত হতো না। উপরন্তু সেকালের মানুষ নিজেকে এতদূর হীন ও লাঞ্ছিত মনে করতো যে, মানুষ যে আল্লাহকে পেতে পারে ও আল্লাহ প্রাপ্ত কোনো সত্ত্বা যে মানুষ হতে পারে, তা তাদের ধারণায় পরিসীমায়ও পৌঁছতে পারতো না।

এ অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পৃথিবীর এমন এক ক্ষুদ্র দেশ ছিল, যেখানে এ অন্ধকার অধিকতর পুঞ্জীভূত হয়েছিল। সেকালের সভ্যতা ও তামাদ্দুনের দৃষ্টিতে যেসব দেশ সভ্য বলে গণ্য হতো সেগুলোর মাঝখানে আরব দেশ সব দেশ হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। চতুর্দিকে পারস্য, রোম, মিশর দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কতকটা নিদর্শন পাওয়া যেতো। কিন্তু বালির অসীম সমুদ্র আরব দেশকে তা হতে রেখেছিল সম্পূর্ণ সতন্ত্র করে। আরব সওদাগর উষ্ট্রযান যোগে কয়েক মাস ধরে এ মরু পথ পরিক্রম করে যেতো এসব দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করার জন্য এবং পণ্যের বিনিময় করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতো। সে দেশের জ্ঞান ও সভ্যতার একবিন্দু স্পর্শও তারা নিজ দেশের জন্য সাথে করে আনতো না। আরব দেশে না ছিল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না গ্রন্থাগার। লোকদের মধ্যে যেমন ছিল না কোনো জ্ঞান শিক্ষার চর্চা, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতিও তাদের ছিলো না কোনো আগ্রহ ও কৌতুহল। সমগ্র দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মাত্র কিছুটা লেখা-পড়া জানতো বটে। কিন্তু সেকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তাকে আদৌ যথেষ্ট বলা চলে না। তাদের নিকট উচ্চমানের এক সুসংবদ্ধ ভাষা বর্তমান ছিল, উচ্চ চিন্তাধারা প্রকাশ করার অসাধারণ যোগ্যতাও তার ছিল। তাতে উন্নততর সাহিত্যিক রুচি ও মাধুর্যও বর্তমান ছিল। কিন্তু তাদের সাহিত্যের যে অবশিষ্টাংশ আমরা দেখতে পেয়েছি, তা হতে মনে হচ্ছে যে, তাদের জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহযীব ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত নিম্নস্থানীয়। অন্ধ কুসংস্কারে ভর্তি ছিল তাদের চিন্তাধারা। বর্বরতাপূর্ণ ও জঘন্য ধরনের ছিল আদত-অভ্যাস। তাদের নৈতিকতার ধারণা ছিল অত্যন্ত হাস্যকর।

আরবদের এ ভূখণ্ডে কোনো সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা ছিলো না, ছিলো না কোনো নিয়ম ও শৃঙ্খলা। প্রত্যেকটি গোত্রই ছিল, স্বাধীন নিরংকুশ ও খোদমুখতার। কেবল 'জংলী কানুনই' সেখানে মেনে চলা হতো। সময় ও

সুযোগ হলেই একজন অপরজনকে হত্যা করতো, তার অর্থ–সম্পদ দখল করে বসতো। যেন ব্যক্তি তার 'গোত্র উদ্ভূত নয়' তাকে সে হত্যা করবে না কেন, কেন কেড়ে নিবে না তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ, তা ছিল আরবদের বুদ্ধির অতীত।

নৈতিকতা, তাহযীব ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের যেসব ধারণা ছিল, তা ছিল অত্যন্ত সাধারণ, অপরিপক্ক ও অপরিচ্ছন্ন। পাক-নাপাক, সুন্দর ও কুৎসিত, ভালো ও মন্দের যে পার্থক্য, তার সাথে তারা ছিলো না এক বিন্দু পরিচিত। তাদের জীবন ছিলো কদর্য রীতিনীতি ও বর্বরতামূলক। ব্যভিচার, জুয়া, মদ, লুট-তরাজ, হত্যা, রক্তপাত প্রভৃতি জঘন্য কাজ ছিল তাদের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তারা অপর লোকের সামনে সম্পূর্ণভাবে উলংগ হতেও বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করতো না। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত বিবস্ত্র হয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো। তারা নিজেদের কন্যা সন্তানদেরকে নিজেদের হাতেই জীবন্ত দাফন করতো এবং তা এ (মূর্খতাব্যঞ্জক) চিন্তা করে যে, মেয়ে জীবিত থাকলে একজনকে 'জামাই' বানাতে হবে। তারা পিতার মৃত্যুর পর সৎমাতাকে পর্যন্ত বিবাহ করতো। পানাহার, পোশাক ও পাক-পবিত্রতার সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত তাদের জানা ছিলো না।

ধর্মের দৃষ্টিতে সেকালে দুনিয়া যেসব মূর্খতা ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিল, এ আরবগণও তার সমানভাবে অংশীদার ছিল। মূর্তি পূজা, মৃত মানুষের আত্মার পূজা, নক্ষত্র পূজা—এক আল্লাহর বন্দেগী ও উপাসনা ছাড়া তখনকার দুনিয়ায় যত ধরনের অসংখ্য প্রকারের পূজার প্রচলন ছিল তার সবই সেই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের নবীগণ এবং তাদের প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে তাদের নিকট কোনো নির্ভুল জ্ঞান ছিল না। তারা অবশ্য একথা জানতো যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) তাদের পূর্বপুরুষ, কিন্তু এ মহান পূর্বপুরুষদের দীন কি ছিলো, তারা কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতেন, সেই সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলো না। 'আদ' ও 'সামুদ' প্রভৃতি প্রাচীন জাতিসমূহের কিচ্ছা-কাহিনীও তাদের কাছে অজানা ছিলো না, কিন্তু তাদের যেসব বর্ণনা আরব ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন তাতে হযরত সালেহ (আ) ও হযরত হূদ (আ)-এর শিক্ষা ও আদর্শের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মাধ্যমে বনী ইসরাঈল বংশের নবীগণ সম্পর্কে অনেক কথাই তাদের নিকট পৌঁছেছিলো। কিন্তু তা যে কি বস্তু ছিলো

কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর লেখকের উল্লেখিত ইসরাঈলী কিংবদন্তি হতে সে সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা করা যায়। এ নবীগণ যে কি ধরনের লোক ছিলেন ও নবুয়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা যে কত নীচ ও হীন ছিলো, তা ঐসব বর্ণনা পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়।

ঠিক এ সময়—এ ধরনেরই এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতামাতা ও পিতামহের স্নেহসিক্ত ছায়া হতে বঞ্চিত হয়ে যান। ফলে এরূপ এক অনুন্নত দেশেও লেখা-পড়া ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভের যতটুকু সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিল, তাও তিনি পেলেন না। বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির পর তিনি মহল্লার ছেলে-ছোকরাদের সাথে মিলে ছাগল চরাতে শুরু করেন। যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। উঠা-বসা, চলাফেরা ও মিল-মিশ সবকিছুই পূর্বোল্লিখিত ধরনের আরব লোকদের সাথেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। লেখাপড়া ও শিক্ষার একবিন্দু স্পর্শ পর্যন্ত লাগেনি। কেননা তদানীন্তন আরবে শিক্ষিত লোকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কয়েকবার তিনি আরবের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পান বটে, কিন্তু এ বিদেশ যাত্রাও কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। সেকালের আরব ব্যবসায়ী কাফেলা যে রকম চলতো তার এ সফরও অনুরূপ ছিলো। এ সফর ব্যাপদেশে কোথাও জ্ঞান ও সভ্যতার কিছু নিদর্শন তিনি দেখতে পেলেও এরূপ এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষিত লোকদের সাক্ষাত লাভ করে থাকলেও এরূপ বিক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ ও সাময়িক দেখা-সাক্ষাত যে কোনো লোকের চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, তা সুস্পষ্ট। এরূপ সাক্ষাতের প্রভাবে কোনো ব্যক্তিই তার গোটা পরিবেশ হতে এতদূর স্বতন্ত্র ও ভিন্ন চরিত্রের হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। এ সুযোগে এতখানি শিক্ষালাভও কারো পক্ষে সম্ভব হয় না, যার ফলে একজন উম্মি নিরক্ষর ব্যক্তি দেশ কাল নির্বিশেষে সমগ্র দুনিয়ার ও সমগ্র কালের 'নেতা' হতে পারে। তিনি বাইরের লোকের নিকট হতে কোনো এক পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করে থাকলেও তখনকার দুনিয়ায় শিক্ষার অস্তিত্ব পর্যন্ত কোথাও ছিল না। ধর্ম, নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সেকালে কোনো ধারণাও ছিলো না, মানবীয় চরিত্রের নমুনাই কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না, সেই সবকিছু লাভ করার কোনো উপায়ই তাঁর ছিলো না।

কেবল আরবেই নয়, তখনকার সমগ্র দুনিয়ার পরিবেশ সামনে রেখে চিন্তা করতে হবে। আলোচ্য ব্যক্তি যেসব লোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদের মধ্যে বাল্য ও শৈশবকাল অতিবাহিত করলেন, যাদের সাথে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন, যাদের সাথে তাঁর

মেলামেশা ও চলাফেরা ছিলো, যাদের সাথে তাঁর দিন-রাতের লেনদেন, কাজ-কারবার সম্পন্ন হতো, জীবনের প্রথম হতেই অভ্যাসে, চরিত্রে সেসব লোক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠলেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, তার সততা-সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিতো তখনকার গোটা জাতিই। তার কোনো প্রাণের দুশমনও তার উপর মিথ্যা বলার কোনো অভিযোগ আরোপ করতে পারেনি। তিনি কারো সাথে অশ্লীল কথা বলতেন না, কেউ তার মুখে অশ্লীল কথা বা গালাগালি উচ্চারিত হতে শুনতে পাননি। তিনি লোকদের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে চলতেন, কিন্তু কখনো কারো সাথে রূঢ় ভাষা ব্যবহার বা ঝগড়া-ফাসাদ করেননি। তার কণ্ঠে কঠোর ভাষার পরিবর্তে মিষ্ট ভাষাই সবসময় উচ্চারিত হতো। ফলে যে কেউ তার সাথে সাক্ষাত করতো, তার দিকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়ে যেতো। কারো সাথে তিনি কোনো খারাপ মোয়ামেলা বা ব্যবহার করেননি। কারো 'হক' নষ্ট বা হরণ করেননি। বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা বাণিজ্য করা সত্ত্বেও কারো এক পয়সা পরিমাণও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি। যাদের সাথে তার লেনদেন ও কাজ-কর্মের সম্পর্ক, তারা সকলেই তার বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। গোটা জাতিই তাকে 'আল আমীন' উপাধী দান করে। শত্রু পক্ষের লোকেরা পর্যন্ত তার নিকট নিজেদের মূল্যবান সম্পদ গচ্ছিত রাখে এবং তিনি সেই সবের পূর্ণ হেফাযত করেন। চারিদিকে প্রায় সকল লোকই লজ্জাহীন, তার মধ্যে তিনি এমন একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি যে, জ্ঞানের উন্মেষকাল হতে তাকে কেউ উলংগ দেখতে পায়নি। চরিত্রহীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তিনি একা এমন চরিত্রবান ও পূত প্রকৃতির লোক যে, তিনি কখনো কোনো অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হননি। মদ পান বা জুয়া খেলায় যোগদান করেননি। নোংরা লোকদের মধ্যে তিনি এমন সুসভ্য ব্যক্তি যে, সকল প্রকার অসভ্যতা ও মলিনতাকে তিনি ঘৃণা করেন ও বর্জন করে চলেন। বরং তার প্রত্যেক কাজেই পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা পরিস্ফুট ছিলো। পাষাণ দিল লোকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি, সকলেরই দুঃখ-দরদে তিনি শরীকদার। ইয়াতীম ও বিধবাদের সাহায্য করেন। কাউকে তিনি কোনো প্রকার আঘাত দেন না। বরং তিনি অপর লোকদের জন্য সকল প্রকার দুঃখ অকাতরে স্বীকার করেন। পশু স্তরের লোকদের মধ্যে তিনি অবিচল শান্তি প্রিয় লোক, নিজ জাতির লোকদেরকে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত দেখে কষ্টবোধ করেন। গোত্রীয় লড়াই-বিবাদ হতে তিনি অতিশয় দূরে সরে থাকেন। সন্ধি মিলন সৃষ্টির চেষ্টায় তিনি অগ্রসর। মূর্তি পূজ

ারীদের মাঝে তিনি এক সুস্থ প্রকৃতি ও অনাবিল বুদ্ধির লোক, আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি কোনো কিছুই পূজ্য বা পূজনীয় বলে মনে করেন না। কোনো সৃষ্টির সামনে তাঁর মাথা অবনমিত হয় না, মূর্তিদের সামনে প্রদত্ত অর্ঘ খেতেও তিনি কখনো প্রস্তুত হন না। তার দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিরক ও সৃষ্টি পূজার মলিনতা হতে পবিত্র।

এরূপ পরিবেশে এ ব্যক্তি এমনভাবে পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে, যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ, কিংবা পাথর স্তুপের মধ্যে একটি হীরক খণ্ড চকমক করছে।

প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত এরূপ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পর তার জীবনে সহসা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন অন্ধকার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাকে পরিবেষ্টনকারী এ মূর্খতা, চরিত্রহীনতা, অনৈতিকতা, বিশৃংখলা, শিরক ও ভূত-পরস্তীর ভয়াবহ সমুদ্র হতে তিনি নিষ্কৃতি পেতে চান। এ পরিবেশে কোনো একটি জিনিসও তার স্বভাবের অনুকূল মনে হয় না। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে—সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে লোকালয় হতে দূরে পর্বত গুহায় অবস্থান করতে শুরু করলেন। নিতান্ত একাকীত্বে পূর্ণ প্রশান্তিময় পরিবেষ্টনীতে একাধারে কয়েক দিন ও রাত অতিবাহিত করেন। এ সময় রোযা রেখে তিনি নিজের রূহ, দিল ও দিমাগকে অধিকতর পবিত্র ও সিদ্ধি পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। এ সাথে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকেন। তিনি এমন একটি প্রজ্জ্বল আলোকের সন্ধান করতে ছিলেন, যার দ্বারা চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরীভূত করতে সমর্থ হবেন। এমন এক শক্তি অর্জনেরও তিনি অভিলাষী ছিলেন, যার সাহায্যে তিনি এ অধপতিত জগতকে ভেঙ্গে-চুরে এক নতুন জগতের সৃষ্টি করতে পারবেন।

সহসা তাঁর অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। হঠাৎ তার হৃদয় মনে এমন এক আলোকচ্ছটা তিনি অনুভব করতে থাকেন, যা অপূর্ব, সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি এমন এক শক্তিও লাভ করেন, যা ইতিপূর্বে কোনো দিনই তার ছিলো না। তিনি পর্বত গুহা হতে বের হয়ে লোকালয়ে ফিরে আসেন। লোকদের সম্বোধন করে বলতে শুরু করেন ঃ তোমরা যে মূর্তির সামনে অবনত হও, এসবের কোনোই অর্থ নেই, এটা পরিত্যাগ করো, কোনো মানুষ, কোনো বৃক্ষ, কোনো পাথর, কোনো আত্মা, কোনো গ্রহ পূজনীয় নয়, কারো সামনে মাথা নত করা যায় না। এরা তার উপযুক্তও নয়। এ সবগুলোর বন্দেগী, দাসত্ব, হুকুম-বরদারী ও আনুগত্য করা যেতে

পারে না। এ জমি, চাঁদ-সরুজ, নক্ষত্র, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র জিনিসই এক মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনিই তোমাদের ও এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রিযকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা। অতএব কেবলমাত্র তারই সামনে মাথা অবনত করো।

চুরি-লুট-তরাজ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, যুলুম, নিপীড়ন, যেনা-ব্যভিচার—দিন-রাত যেসব কাজে তোমরা লিপ্ত হয়ে আছো, এসবই গুনাহের কাজ, এটা পরিত্যাগ করো। আল্লাহ এটা কিছুমাত্র পসন্দ করেন না। সত্য কথা বলো, ইনসাফ করো, কাউকে হত্যা করো না, কারো মাল কেড়ে নিও না। যা গ্রহণ করবে সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা সহকারে গ্রহণ করে। আর যা দিবে, ইনসাফ অনুযায়ী দাও। তোমরা সকলেই মানুষ, নীচ নহে, কেউ ইয্যতের গৌরব নিয়ে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেনি। সম্মান ও মর্যাদা বংশ বা খান্দানের ভিত্তিতে স্থিরকৃত হয় না। কেবল আল্লাহর আনুগত্য, সত্যানুশীলন ও পবিত্রতাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড। যে আল্লাহকে ভয় করে, সত্যানুসারী, পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন, সে-ই হচ্ছে উন্নত মানুষ। তার যে সেই রূপ নয়, সে কিছুই নয়। মৃত্যুর পর তোমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর সেই আল্লাহ তিনিই, যিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তোমরা কোনো জিনিস তার নিকট হতে গোপন করতে পারো না। তোমাদের জীবনের আমলনামা যথাযথরূপে—কোনোরূপ কমবেশী ও রদ-বদল ছাড়াই তার সামনে হাজির করা হবে। আর সেই আমলনামার দৃষ্টিতেই তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত সুবিচারক মহান আল্লাহর সামনে কোনো প্রকার সুপারিশ কাজে আসবে না, ঘুষদানের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। কারো বংশীয় মর্যাদারও সেই দিন কোনো মূল্য হবে না। সেখানে মূল্য হবে কেবলমাত্র ঈমান ও নেক আমলের। এ মূলধন সেদিন যার নিকট থাকবে, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আর যার নিকট এসবের কিছুই থাকবে না সে ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ পয়গাম নিয়েই তিনি পর্বত গুহা হতে বের হয়েছিলেন।

মূর্খ জাতি তাঁর বিরুদ্ধতা করতে শুরু করে। গালাগালি করে, মন্দ বলতে শুরু করে। মারার জন্য হাত উত্তোলন করে। একদিন, দুই দিন নয়, এক সাথে তেরটি বছর পর্যন্ত তাঁর উপর কঠোরভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বদেশ হতে বের করে দেয়া হয়। আর কেবল বের করে দিয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি। স্বদেশ হতে বের

হয়ে যেখানে গিয়ে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে গিয়ে পর্যন্ত তারা তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। সমগ্র আরব দেশকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর তিনি এই সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করতে থাকেন, কিন্তু স্বীয় আদর্শ ও কাজ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

কিন্তু এ জাতি তাঁর দুশমন হলো কেন ? তাদের সাথে অর্থ বা নারী নিয়ে কোনো বিবাদ ছিলো কি ? রক্তপাত বা খুন-খারাবীর কোনো ব্যাপার ছিলো কি ? তিনি কি তাদের নিকট পার্থিব কোনো জিনিস পাবার জন্য দাবী জানিয়ে ছিলেন ? ..... না, তা কিছুই নয়। সমস্ত শত্রুতার মূল কারণ ছিলো একটি এবং তা এই যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে, পরহেযগারী ও ন্যায়নীতি পালন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ অপরাধ তিনি কেন করলেন ? মূর্তিপূজা, শিরক ও খারাপ কাজের বিরুদ্ধে কেন তিনি প্রচার করলেন ? পূজারী ও পুরোহিতদের পেশার উপর আঘাত হানলেন কেন ? মোড়ল সরদারদের মোড়লীসরদারী কেন পণ্ড করতে চাইলেন ? সমাজ থেকে পার্থক্য প্রাচীর চূর্ণ করতে চান কেন ? বংশীয় ও গোত্রীয় হিংসা-দ্বেষকে মূর্খতা বলে প্রচার করেন কেন ? প্রাচীনকাল থেকে যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপনা চলে আসছে, তা তিনি চূর্ণ করতে চান কেন ? বস্তুত জাতির দৃষ্টিতে তার এই সমস্ত কথাই বংশীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় রীতিনীতির বিপরীত। তাই জাতির লোকেরা তাঁকে এ কাজ পরিত্যাগ করতে বললো, অন্যথায় তাঁর জীবন সংকটাপন্ন করে দেয়া হবে বলে হুমকি প্রদান করলো।

তাহলে সেই প্রশ্ন জাগে ঃ তিনি এরূপ নির্যাতন ভোগ করলেন কেন ? জাতির লোকেরা তো তাঁকে দেশের বাদশাহী দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁর পায়ের তলে ধন-সম্পদের স্তুপ করে দেয়ার জন্য তৈরি ছিলো। এর জন্য শুধু এ শর্তটুকু আরোপ করেছিল যে, তাঁকে তাঁর আদর্শ প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু তিনি এ সবকিছুকেই উপেক্ষা করলেন। আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তরাঘাত ও সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন বরদাশত করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য তিনি এরূপ করলেন ? লোকদের আল্লাহর অনুগত নেক্‌কার ও চরিত্রবান হওয়ায় তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল কি ? এবং সেই স্বার্থ কি রাজ ক্ষমতা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, ধন-দৌলত ও আয়েশ-আরামের দুর্নিবার মোহ অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই স্বার্থ কি এতোই বড় ছিলো, যার জন্য এক ব্যক্তি

কঠোর দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক অশান্তিতে নিমজ্জিত হতে এবং দীর্ঘ তেশইটি বছর পর্যন্ত তা অকাতরে সহ্য করতে পারেন ? এটা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। এক ব্যক্তি নিজের কোনো স্বার্থের জন্যও নয়, বরং জনগণের মানসিক মংগল বিধানের উদ্দেশ্যই প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করতে প্রস্তুত হলেন—আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা ও কুরবানী স্বীকারে এতদপেক্ষা উন্নত কোনো মান ধারণা করা যায় কি ? সেই সাথে এটাও বিবেচ্য যে, যাদের মংগলের জন্য তিনি এই সমস্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তারাই তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে, জন্মভূমি হতে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করছে, এমন কি বিদেশেও তাঁর পশ্চাদ্বাবন করতে ক্রটি করছে না। অথচ এসব সত্ত্বেও তিনি তাদের কল্যাণ কামনা হতে বিন্দুমাত্র বিরত হন না।

দ্বিতীয়ত, কোনো মিথ্যাবাদী কি কোনো অমূলক বিষয়ের পশ্চাতে ছুটে এরূপ বিপদ ও দুঃখ-মুসিবত সহ্য করতে পারে ? নিছক আন্দাজ-অনুমান দ্বারা চালিত কোনো ব্যক্তি কি কথার জন্য এরূপ অচল অটল হয়ে দাঁড়াতে এবং এজন্য পর্বত পরিমাণ বিপদ সহ্য করতে পারে ? বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কি কঠিন বিপদ নেমে এসেছিলো, কিরূপে সমগ্র দেশ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো, বড় বড় সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়েছিলো, তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাধনার পথ হতে একবিন্দুও নড়তে প্রস্তুত হননি। এ দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা হতে স্বতঃই প্রমাণিত যে, তাঁর আদর্শের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ে অপরিসীম প্রত্যয় জন্মেছিলো। এ ব্যাপারে যদি তাঁর মনে একবিন্দু সন্দেহেরও উদ্রেক হতো, তাহলে তিনি ক্রমাগত তেইশ বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বিপদ-আপদের মুকাবিলায় কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না।

আলোচ্য ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণের এটা একটি দিক মাত্র। তাঁর অবস্থার অপর দিক এটা হতেও বিস্ময়কর।

চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি আরববাসীদের ন্যায়ই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে একজন বড় ভাষণদাতা এবং অনন্য সাধারণ বক্তা হিসাবেও কেউ জানতে পারেনি। বুদ্ধি-জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলতেও কেউ শুনতে পায়নি। ধর্মতত্ত্ব, নীতি-দর্শন, আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কথা বলতেও কেউ তাঁকে দেখেনি। কেউ তাঁর কাছ থেকে আল্লাহ,

ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, অতীতকালের বিভিন্ন জাতি, কিয়ামত, পরকালীন জীবন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে একটি কথাও শুনতে পায়নি। তিনি যদিও প্রথম হতে অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট এবং স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। কিন্তু চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সত্ত্বায় এমন কোনো অনন্য সাধারণ বিষয় পরিলক্ষিত হয়নি, যার ভিত্তিতে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কিছু আশাবাদী হওয়া যেতো। তখন পর্যন্ত লোকেরা তাঁকে কেবলমাত্র একজন স্বল্পবাক, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ ভদ্রলোক হিসাবেই জানতো। কিন্তু চল্লিশ বছর পর তিনি যখন পর্বত গুহা থেকে এক অভিনব পয়গাম নিয়ে আসলেন, তখন তাঁকে অপূর্ব লোক হিসাবে দেখা গেলো।

এরপর তিনি এক বিস্ময়কর বাণী শুনাতে শুরু করলেন। তাঁর সেই বাণী শুনে সমগ্র আরববাসী বিস্মিত ও হতচকিত হতে লাগলো। এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতো তীব্র ও গভীর ছিলো যে, প্রাণের শত্রু পর্যন্ত তা শুনতে ভয় পেতো। কেননা, তা শুনলেই তাদের মর্মস্পর্শ করবে, একথা তাদের জানা ছিল। তাঁর ভাষা সৌন্দর্য ও রচনা-সৌকর্ষ ওজস্বীতা ছিল অপূর্ব, অতুলনীয়। সমগ্র আরব জাতি এবং বড় বড় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক ও বক্তাদেরকে তা স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ পেশ করেছিলো এবং বারবার ঘোষণা করেছিলো যে, [তোমরা এ কালামকে যদি আল্লাহ্‌র কালাম বলে বিশ্বাস না করো—মুহাম্মাদ (স)-এর নিজস্ব রচনা বলেই মনে করো, তাহলে] তোমরা সকলে মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে এর মতো একটি সূরা-ই রচনা করে পেশ করো। কিন্তু এ কালামের সাথে মুকাবিলা করার দুঃসাহস নিয়ে কেউ এগিয়ে আসলো না। বস্তুত আরব জাতি এরূপ অতুলনীয় কালাম ইতিপূর্বে কখনই শুনতে পায়নি।

এ সময় তিনি সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এক অতুলনীয় তত্ত্বজ্ঞানী, সমাজ ও নৈতিক সংস্কারক, একজন সুদক্ষ সমাজনীতিবিদ, শক্তিমান আইন প্রণেতা, উচ্চস্তরের বিচারপতি এবং অদ্বিতীয় সেনাধ্যক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এহেন নিরক্ষর মরুবাসী যেসব জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত কথাবার্তা বললেন, তা যেমন পূর্বেও কেউ বলতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ বলতে সক্ষম হবে না। এ উম্মী ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। মানবজাতির ইতিহাস থেকে তার উত্থান ও পতন সম্পর্কে বহু অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা পেশ করতে শুরু করলেন। প্রাচীনকালের সমাজ সংস্কারকদের কার্যাবলী এবং বিশ্বের ধর্মমতসমূহের সমালোচনা এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক

দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসা করতে লাগলেন। মানুষকে উন্নত নৈতিক আদর্শ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সুসংবদ্ধতার শিক্ষা দিতে লাগলেন। সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনীতি, পারস্পরিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে শুরু করলেন এবং তিনি এমন সব আইন রচনা করতে সমর্থ হন, যার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা, সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতা অনুধাবন করার জন্য দুনিয়ার পণ্ডিত বিদগ্ধ ও বুদ্ধিমান লোকদেরও গভীর চিন্তা-গবেষণা ও জীবন ব্যাপী সাধনা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হলো। আর মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি হতে থাকবে, তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য ততই উদঘাটিত ও বিকশিত হবে। তিনি ছিলেন একজন নীরব শান্তিবাদী সওদাগর। সমগ্র জীবনে যিনি কোনো দিন তরবারি চালাননি। কখনো সামরিক শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভ করেননি। সমগ্র জীবন যিনি একটি মাত্র যুদ্ধে একজন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এহেন ব্যক্তিই একজন অভাবিতপূর্ণ বীরসেনানী হয়ে গেলেন। যে কোনো কঠিনতম যুদ্ধেও তিনি নিজের নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ হটে যাননি। শুধু একজন সৈনিকই নন তিনি রীতিমতো একজন অনন্য সাধারণ সেনাধ্যক্ষে পরিণত হয়েছিলেন। মাত্র নয় বছরের মধ্যে আরব জাহানকে তিনি জয় করেছিলেন। তিনি এমন এক আশ্চর্য ধী-শক্তিসম্পন্ন সমরনায়ক হয়েছিলেন যে, তার সংগঠিত সামরিক ভাবধারা ও তৎপরতার প্রভাবে অবলম্বনহীন আরব জনতা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তদানীন্তন দুনিয়ার দুটি বিরাট সামরিক শক্তিকে উৎপাটন করতে সমর্থ হন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্লিপ্ত, নির্বিকার ও নির্বাক মানুষ। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর মধ্যে কোনোরূপ রাজনৈতিক প্রবণতা ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। সহসা তিনি এমন এক সুদক্ষ সমাজ সংস্কারক ও সমাজ পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন যে, তেইশ বছরের মধ্যে তিনি বার লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত মরুভূমির বিক্ষিপ্ত যুদ্ধবাজ, গণ্ডমূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ, অসভ্য, অসামাজিক ও চিরকালের আত্মকলহপ্রিয় গোত্রসমূহকে এক ধর্ম, এক জীবন ব্যবস্থা, এক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, এক রাষ্ট্র ও সভ্যতা, এক আইন ও এক অখণ্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে সুসংবদ্ধ করে নিলেন। এ বিরাট কাজে তিনি আধুনিককালের রেলগাড়ি, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন ও মুদ্রণযন্ত্রের কোনো সাহায্যই গ্রহণ করেননি।

উপরন্তু তিনি তাদের সমগ্র চিন্তা ও মতাদর্শ মূলগতভাবেই পরিবর্তিত করে দেন—তাদের নৈতিক চরিত্র বদলিয়ে দেন। তাদের অমার্জিত জীবন-

ধারাকে পরিমার্জিত করে উন্নত আদর্শে গড়ে তোলেন। তাদের বর্বরতাকে সুরুচিমণ্ডিত সভ্যতায়, তাদের চরিত্রহীনতা ও অসচ্চরিত্রতাকে পরিচ্ছন্নতা, তাকওয়া ও মহৎ চরিত্রে পরিবর্তিত করে দেন। তাদের অনমনীয়তা ও অরাজকতা অতুলনীয় অসীম আইনানুবর্তিতা ও নেতার আনুগত্যে রূপান্তরিত হয়। আরব জাতি ছিলো দীর্ঘকাল পর্যন্ত বন্ধ্যা। কয়েক শতাব্দী যাবত্ এ জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়নি। এহেন জাতিকে তিনি এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, অতপর সেই জাতির মধ্যে হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় এবং দুনিয়ার সমাজকে তাঁরা দীন, নৈতিকতা, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

কিন্তু এ বিরাট কাজ তিনি কোনো যুলুম-পীড়ন, অত্যাচার-অবিচার, জোর-যবরদস্তি ও ধোঁকা-প্রতারণার সাহায্যে সম্পন্ন করেননি—করেছেন পূত-পবিত্র, চরিত্র, প্রাণজয়ী ভদ্রতা ও শিষ্টতা এবং মগয দখলকারী চিন্তা ও শিক্ষার সাহায্যে। তিনি তাঁর চরিত্র বলে পরম শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। দয়া, অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও মহানুভবতার দ্বারা তিনি মানুষের মনকে বিগলিত করেছেন। ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হননি। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ও তিনি কাউকে প্রতারিত করেননি, ওয়াদা ভংগ করেননি। প্রাণের শত্রুর প্রতিও তিনি কখনো যুলুম করেননি। যারা তাঁর রক্তের পিপাসু ছিলো, যারা তাঁকে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো, দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলো তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো, এমনকি শত্রুতার প্রতিহিংসায় তাঁর চাচার কলিজা পর্যন্ত চিবিয়েছিলো, তাদের উপর জয় লাভ করে তিনি তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্য তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

এসব ছাড়াও তিনি ছিলেন অতুলনীয় আত্মসংযমী স্বার্থহীনতার বাস্তব প্রতিমূর্তি। তিনি যখন সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, তখনো পূর্বের মতো দীনহীনই ছিলেন। পর্ণ কুটীরে তিনি বাস করতেন, চট বিছিয়ে শুইতেন। মোটাসোটা কাপড় পরতেন। দীনহীনের মতোই খাদ্য গ্রহণ করতেন। অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত থাকতেন। উপর্যুপরি কয়েক রাত পর্যন্ত তিনি আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গরীব ও বিপদগ্রস্ত লোকদের খেদমত করতেন। একজন সাধারণ মজুরের মতো কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সম্রাটসুলভ দাপট, শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও মানুষের মতো অহংকারের এতোটুকু গন্ধও সৃষ্টি হতে পারেনি।

তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই লোকদের সাথে মিলিত হতেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশায় অংশ গ্রহণ করতেন। জনসাধারণের সাথে একত্রিত হয়ে বসলে, কোন্ ব্যক্তি মজলিসের সরদার, প্রধান বা দেশের বাদশাহ তার হদীস করা অপরিচিত লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হতো। এতবড় ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তিনি ক্ষুদ্র মানুষের সাথে তাদেরই সমান পর্যায়ের লোক হিসাবে ব্যবহার করতেন। সমগ্র জীবনের চেষ্টা ও সাধনায় তিনি নিজের জন্য কিছুই রেখে যাননি। তাঁর অবশিষ্ট ও পরিত্যক্ত সমস্ত কিছুই তিনি জাতির জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। তাঁর অনুসারীদের উপর তিনি তাঁর নিজেদের কিংবা নিজ সন্তান ও বংশ জাতের কোনো অধিকার চাপিয়ে দেননি। এমনকি তাঁর সন্তান ও বংশধরদের যাকাত গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত করে গেছেন। অন্যথায় তাঁর অনুসারী লোকদের সম্পূর্ণ যাকাত কেবল তাঁর সন্তান ও বংশজাত লোকদেরকেই দান করার প্রবল আশংকা দেখা দিতো।

এহেন বিরাট ব্যক্তিত্বের কীর্তি ও অবদানের ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে বিশ্ব ইতিহাসের উপর ব্যাপকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। এ দৃষ্টিপাতের ফলে স্পষ্ট জানা যাবে যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ভূমিষ্ঠ আরব মরুভূমির এ নিরক্ষর মরুচারীই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা, সমগ্র দুনিয়ার নেতা। তাঁকে যারা নেতা মেনে নিয়েছে, তিনি কেবল তাদেরই নেতা নন, যারা তাঁকে মানে না তিনি তাদেরও নেতা। তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণ এতোটুকু অনুভব করতে পারেন না যে, যাঁর বিরুদ্ধে তারা লম্বা লম্বা কথা বলে, তাঁর নেতৃত্ব তাদের চিন্তা-বিশ্বাসে, জীবন পদ্ধতিতে, কর্মপ্রণালী এবং আধুনিক যুগের ভাবধারায় কতো গভীরভাবে মিশে গেছে।

দুনিয়ার যাবতীয় ধারণা-বিশ্বাসের গতিকে তিনি কুসংস্কার, অলৌকিকত্ব, পূজা ও বৈরাগ্যবাদ থেকে ফিরিয়ে বুদ্ধিবাদ, বাস্তব বিচার ও তাকওয়ামূলক বৈষয়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। স্থূল ও বাস্তব মুজিযা কামী দুনিয়ায় বুদ্ধি-জ্ঞান ও প্রতিভার মুজিযা অনুধাবন করা এবং তাকেই সত্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে স্বীকার করে নেয়ার রুচি লোকদের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন। অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনেই যারা আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন অনুসন্ধানকারী তাদের চক্ষুকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে (Natural Phenomena) আল্লাহর অস্তিত্বের চিহ্ন খোঁজ করতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। যারা কল্পনার ঘোড়া ছুটাতে অভ্যস্ত

তাদেরকে ধারণা-অনুমান (Speculation) হতে ফিরিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রয়োগ, চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পথে তিনিই পরিচালিত করেছেন। বুদ্ধি-জ্ঞান,. ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও হৃদয়ানুভূতির বেশিষ্ট্যপূর্ণ সীমা-সরহদ মানুষকে তিনিই দিয়েছেন। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। দীনের সাথে জ্ঞান ও কর্মের এবং জ্ঞান ও কর্মের সাথে দীনের গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। ধর্মের শক্তির সাহায্যে দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক ভাবধারা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারা থেকে বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ধার্মিকতার সৃষ্টি করেছেন। শিরক ও সৃষ্টি পূজার সমগ্র ভিত্তিকে তিনিই উৎপাটন করেছেন। জ্ঞানের শক্তি দ্বারা তাওহীদ বিশ্বাসকে এমন দৃঢ় বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মুশরিক ও মূর্তিপূজারীরা ধর্ম ও তাওহীদের ভাবধারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। চরিত্র, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদের মৌলিক ধারণাসমূহকে তিনিই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যারা দুনিয়া ত্যাগ করা ও কৃচ্ছ্রসাধনকে চরিত্র বলে মনে করতো, নফস ও দেহের অধিকার আদায় করা ও বৈষয়িক জীবনের কাজ-কর্মে অংশগ্রহণের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির সম্ভাবনাকে পর্যন্ত স্বীকার করতো না। তাদেরকে তিনিই সভ্যতা, সামাজিকতা ও বৈষয়িক কাজ-কর্মে নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক বিকাশ ও মুক্তি লাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন। মানব জীবনের প্রকৃত মূল্যমানের সাথে তিনিই মানুষকে পরিচিত করেছেন। যারা ভগবান, অবতার ও আল্লাহর পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত হেদায়াতকারী ও প্রথপ্রদর্শকরূপে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না, তাদেরকে তিনিই একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ—তাদেরই মতো মানুষ ও আসমানী বাদশাহীর প্রতিনিধি ও মহান বিশ্ব মালিকের খলীফা হতে পারে। যারা প্রত্যেক শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিজের রব বানিয়ে নিতো, তাদেরকে তিনিই একথা বুঝিয়ে ছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানুষই, মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনো মানুষ পবিত্রতা, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের জন্মগত অধিকার নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেনি। কারো উপর মলিনতা, অপবিত্রতা, গোলামী ও পরাধীনতার জন্মগত কলংক লাগানো নেই। বস্তুত তাঁর এ বিপ্লবী শিক্ষার ফলেই দুনিয়ায় মানুষের ঐক্য, একত্ব, সাম্য, গণতন্ত্র এবং আযাদীর চিন্তা-কল্পনা ব্যাপক ব্যপ্তি লাভ করতে পেরেছে।

ধারণা ও কল্পনার জগত হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাস্তবতার দৃষ্টিতে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে, দুনিয়ায় আইন-কানুন, রীতিনীতি, প্রথা-প্রচলন ও যাবতীয় কাজ-কর্মের উপর এ উম্মী নবীর অসাধারণ নেতৃত্বের

গভীর ও বিরাট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নৈতিক, চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাঁর প্রচারিত অসংখ্য মূলনীতি সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। সমাজ ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে তিনি যেসব আইন ও বিধান রচনা করেছেন, দুনিয়া তার অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে, বর্তমানেও নিচ্ছে। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও মতবাদমূলক বিধানের ভিত্তিতে দুনিয়ায় অসংখ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে, আর এখনো উঠছে। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার যে পন্থা ও পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর প্রভাবে দুনিয়ার রাষ্ট্র-দর্শনেও রাজনৈতিক মতবাদের বিপ্লব সূচিত হয়েছে ও হচ্ছে। আইন ও ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেসব মূলনীতি রচনা করেছিলেন তা দুনিয়ার সকল বিচার ব্যবস্থা ও আইন দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বর্তমানেও তার প্রভাব নীরবে, নিঃশব্দে বিস্তার লাভ করছে। যুদ্ধ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের এক নবতর পর্যায় যিনি কার্যত দুনিয়ায় প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি আসলে ছিলেন আরবের এক উম্মী নবী। অন্যথায় যুদ্ধেরও কোনো সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার হতে পারে এবং বিভিন্ন জাতির মিলিত মনুষত্বের বুনিয়াদেও দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পন্ন হতে পারে, সেই সম্পর্কে এর পূর্বে দুনিয়াবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো।

মানবেতিহাসের পটভূমিকায় এ আশ্চর্যজনক ব্যক্তির মহান ব্যক্তিত্ব এতোদূর কালজয়ী মনে হয় যে, প্রথম থেকে বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি—বিশ্বের খ্যাতনামা হীরোগণকেও (Heroes) তাঁর তুলনায় অত্যন্ত ম্লান ও ক্ষীণ মনে হয়। দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব মানব জীবনের প্রথমত দুটি ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে দেখা যায়, এটাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এক শ্রেণীর লোক হচ্ছেন চিন্তা-কল্পনা ও নীতি-মতবাদের বাদশাহ—বাস্তব কর্মশক্তি হতে একেবারেই বঞ্চিত। আর অপর শ্রেণী হচ্ছেন কর্মবীর—চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। কারো প্রতিভা রাজনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবস্থাপনা পর্যন্তই সীমিত। কেউ নিছক সামরিক কৃতিত্ব ও দক্ষতার প্রতিরূপ। কেউ আবার সমাজ জীবনের বিশেষ একটি দিকের উপর এমনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন যে, সমাজ জীবনের অপরাপর যাবতীয় দিক তার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। কেউ শুধু মাত্র নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে, কিন্তু জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। কেউ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়েছে। মোটকথা ইতিহাসে কেবল একদেশদর্শী নেতা

ও হীরোই পরিলক্ষিত হচ্ছে, কেবলমাত্র এ এক ব্যক্তিই হচ্ছেন এমন যার মধ্যে সকল প্রকার পূর্ণতা সমন্বয় লাভ করেছে। তিনি নিজেই দার্শনিক, বিজ্ঞানী, নিজেই স্বীয় দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তিনিই আবার রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমরাধ্যক্ষ, আইন প্রণেতা, নীতি ও চরিত্রের দীক্ষাগুরু। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাও তিনি। মানব জীবনের সমগ্র দিকের উপর তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও তার দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। পানাহারে নিয়ম-শিষ্টাচার, দৈহিক পবিত্রতা ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার কায়দা-কানুন হতে আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করেন, পথপ্রদর্শন করেন। নিজের মত ও আদর্শ অনুযায়ী স্বতন্ত্র এক সভ্যতা (Civilization) প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য (Equilibrium) স্থাপন করেছেন যে, কোথাও মাত্রাতিরিক্ততা বা ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় না। মানব-জগতে এরূপ ব্যাপক-ব্যক্তিত্বের কোনো দৃষ্টান্ত কি কোথাও পাওয়া যাবে?

দুনিয়ায় প্রায় সবকটি বড় বড় ব্যক্তিত্বই পরিবেশের সৃষ্টি। কিন্তু এ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এদিক দিয়েও স্বতন্ত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে তাঁর পরিবেশের কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু তদানীন্তন আরব দেশের পরিবেশে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এরূপ সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন প্রমাণ করা যেতে পারে না। খুব টানা-হেঁচড়া করে বললেও এটুকুমাত্র বলা যেতে পারে—এটা অপেক্ষা অধিক কিছুই বলা যায় না—যে ঐতিহাসিক আকর্ষণ এমন এক নেতার আবির্ভাবের দাবী করছিলো, যিনি গোত্রীয় বিচ্ছিন্নতা খতম করে আরব জাতিকে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করে দিবেন। সেই সাথে অন্যান্য দেশ জয় করে আরবদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন। অন্য কথায়, একজন জাতীয়তাবাদী নেতার প্রয়োজন ছিলো, যিনি তদানীন্তন আরবীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক হবেন, যুলুম, নিদর্য়তা, রক্তপাত, ধোঁকা-প্রতারণা প্রভৃতি সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজ জাতিকে সচ্ছল বানিয়ে দিবেন। তদুপরি একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন ও সংগঠন করে অধঃস্তন পুরুষদের জন্য রেখে যাবেন। এছাড়া তদানীন্তন আরব ইতিহাসের অপর কোনো তাকীদ কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না। হেগেলের ইতিহাস দর্শন কিংবা মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে খুব বেশী বললেও এটুকুই বলা সম্ভব যে, সেই সময়কার পরিবেশে এক জাতি ও রাষ্ট্র গঠনকারী একজন নেতার আবির্ভাব অপরিহার্য ছিলো বা আবির্ভাব হতে পারতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার

পরিবেশে এমন এক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটলো, যিনি উত্তম নৈতিক চরিত্র শিক্ষাদাতা, মানবতার পুনর্বিন্যাস সাধনকারী, মানুষের মন-মগয পরিশুদ্ধকারী এবং জাহেলী যুগের সকল প্রকার অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূলকারী ছিলেন। যার দৃষ্টি জাতি, বংশ ও দেশের সীমা চূর্ণ করে বিশ্বমানবতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো, যিনি নিজের জাতির জন্য নয়—বিশ্বমানবের জন্য এক নৈতিক, আধ্যাত্মিক, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যিনি অর্থনৈতিক কাজকর্মে নাগরিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধকে কল্পনার জগতে নয়—বাস্তব জগতে নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করেছেন যে, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভা সে দিনের মতো আজও সম্পূর্ণ নতুন। এমতাবস্থায় হেগেলীয় কিংবা মার্কসীয় দর্শন এর কি ব্যাখ্যা করতে পারে? এরূপ ব্যক্তিকে কি আরব জাহেলিয়াতের তদানীন্তন পরিবেশের উৎপাদন বলা যেতে পারে?

তিনি যে পরিবেশের স্রষ্টা ছিলেন না কেবল তাই নয়, তাঁর কীর্তি সম্পর্কে চিন্তা করলে নিসন্দেহে জানা যায় যে, তা সময় ও স্থানের সীমা বন্ধন থেকে বিমুক্ত, তার দৃষ্টি সময় ও অবস্থার বাধা অতিক্রম করে, শতাব্দীকালের সহস্র আবরণ দীর্ণ করে সামনে অগ্রসর হয়। মানুষকে তা প্রত্যেক কাল ও প্রত্যেক পরিবেশের পরিপ্রক্ষিতে বিচার করে থাকে। তার জন্য এমন সব নৈতিক ও বাস্তব বিধান পেশ করে, যা সকল অবস্থায়ই সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে চলতে পারে। ইতিহাস যাদেরকে পুরাতন করে দেয় তা তাদের মধ্যে নয়। প্রাচীনদের তো আমরা কেবল এ হিসাবেই প্রশংসা করতে পারি যে, তাঁরা নিজেদের যুগে 'ভালো নেতা' ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিত্ব কেবল ছিলেন না—বর্তমানেও আছেন। তিনি ছিলেন সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট। বিশ্বমানবতার এমন একজন নেতা, যিনি ইতিহাসের সাথে সাথে অগ্রসর হন এবং প্রত্যেক পরবর্তী যুগেই তিনি থাকেন ঠিক তেমনি 'নতুন', যেমন ছিলেন পূর্ববর্তী যুগে।

আমরা যেমন লোককে উদারতা সহকারে ইতিহাস স্রষ্টা (Makers of History) বলে আখ্যায়িত করি, মূলত তাঁরা ইতিহাসের সৃষ্টি—উৎপাদন (Creation of History)। প্রকৃতপক্ষে মানবতার গোটা ইতিহাসে ইতিহাস স্রষ্টা মাত্র একজন (এবং তিনিই হচ্ছেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি)। দুনিয়ার ইতিহাসে যে কয়জন নেতা বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন,

অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিতে তাদের অবস্থা বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এ ধরনের সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লবের সাজ-সরঞ্জাম পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলো, আর সেসব সরঞ্জাম স্বতঃই বিপ্লবের দিক নির্ণয় ও পথ নির্ধারণ করছিলো। বিপ্লবী নেতা অগ্রসর হয়ে কেবল এতটুকু কাজই করেছেন যে, অবস্থার তাকীদ অনুযায়ী কার্যত বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁর এ কাজের ক্ষেত্র ও কাজ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু ইতিহাস স্রষ্টা কিংবা বিপ্লব সৃষ্টিকারী এ বিরাট কাফেলায় আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্বই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সৃষ্ট বিপ্লবের কোনো উপাদান ও কার্যকারণ সেখানে পূর্ব থেকে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না—তা তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। বিপ্লবের ভাবধারা ও কার্যক্ষম-দক্ষতা সম্পন্ন লোক যেখানে দুর্লভ ছিলো, সেখানে তিনি নিজে উপযুক্ত লোক তৈরি করেছেন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিগলিত করে শতসহস্র মানব প্রতিচ্ছবিতে তা রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের মতো করে নিয়েছেন। তাঁর শক্তি, সামর্থ ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা নিজেই বিপ্লবের সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। নিজেই তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং নিজেই স্বীয় ইচ্ছা-ক্ষমতার প্রাবল্যে অবস্থার গতিকে ঘুরিয়ে স্বীয় পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করেছেন। বস্তুত এ মর্যাদার ইতিহাস স্রষ্টা ও এ পর্যায়ের বিপ্লব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় কি ?

এখন আমরা আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করবো। চিন্তা করার বিষয় ঃ চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় আরবের ন্যায় এক অধিক তমাশাচ্ছন্ন দেশের এক কোণে নিছক রাখাল, সওদাগর ও অশিক্ষিত মরুবাসীর মধ্যে সহসা এতো জ্ঞান, এতো আলো ও এতো শক্তি, এতো প্রতিভা-যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং এতো বিরাট সুদক্ষ শক্তি সৃষ্টি হওয়া মৌলিক কারণ এবং উপায় কি ছিলো ? এটা সে ব্যক্তিরই নিজস্ব মন ও মগযের উৎপাদন ছিলো—বলার পিছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে কি ? যদি তাই হবে, তবে তিনি আল্লাহ্ হওয়ার দাবী করেই বসতেন। যে দুনিয়া রামকে খোদা বানিয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণকে ভগবান রূপে পেশ করেছে, বুদ্ধকে উপাস্য সত্তা রূপে গ্রহণ করেছে, ঈসা মসীহ (আ)-কে নিজ ইচ্ছামতো 'আল্লাহর পুত্র' হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং সেখানে আগুন, পানি ও বাতাসের পর্যন্ত পূজা উপাসনা হতে পারছে, সেই দুনিয়া এহেন প্রতিভাবান ব্যক্তির সেই দাবী কেমন করে অস্বীকার করতে পারতো? .... কিন্তু এ ব্যক্তি নিজের কোনো যোগ্যতা প্রতিভামূলক কাজের কৃতিত্বই নিজে গ্রহণ করেননি বরং তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা

করেছিলেন যে, আমি একজন মানুষ, তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ মাত্র, আমার নিকট আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই, সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত। আমার পেশ করা যে কালামের দৃষ্টান্ত পেশ করতে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিই সমর্থ হয়নি তাও আমার নিজ স্ব কালাম নয়। তা আমার নিজ মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, নিজস্ব প্রতিভারও ফল নয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র নিকট থেকে আমার কাছে এসেছে আর এর প্রশংসাও আল্লাহ্রই প্রাপ্য। আমি যে বিরাট কৃতিত্ব দেখিয়েছি, যেসব আইন-কানুন তৈরি করেছি, যেসব রীতিনীতি ও আদর্শ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি, এর মধ্যে কোনো একটি জিনিসও আমার রচিত নয়। আমি কোনো কিছুই আমার নিজস্ব যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে করতে সমর্থ হইনি। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শনের প্রতি আমি মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছ থেকে যে ইংগিতই আসে আমি তাই বলি।

বিবেচনার বিষয়, এ ঘোষণা কতো বিরাট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও সততার কতো উজ্জ্বল নিদর্শন এটা। মিথ্যাবাদী মানুষ অপরাপর লোকের কাজের সুনাম নিজের বলে দাবী করতে ও নিজের নামে প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না, অথচ সেই সবের মূল উৎসের সন্ধান নেয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এ মহান ব্যক্তি তাঁর সমস্ত কৃতিত্বকেও নিজের বলে দাবী করেন না, অথচ তা করলে কেউ তাঁকে মিথ্যাচারী বলতে পারতো না। কেননা তাঁর কৃতিত্বের মূল উৎসের সন্ধান করার কোনো উপায়ই কারো কাছে নেই। সততা-সত্যবাদিতার এটা অপেক্ষা অকাট্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ আর কি হতে পারে? তিনি অতি গোপন ও প্রচ্ছন্ন উপায়ে এসব অতুলনীয় প্রতিভা ও কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে তার কোনোটারই দাবী না করে এর মূল উৎসের নামেই প্রচার করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার না করার আর কি কারণ থাকতে পারে?

আখেরাত

মৃত্যুর পরে জীবন আছে কি ? যদি থাকে তবে তা কোন্ ধরনের জীবন ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান সীমার বহির্ভূত। কেননা মৃত্যুর সীমারেখার পরপারে কি আছে এবং কি নেই, তা উঁকি মেরে দেখার মতো চক্ষু আমাদের নেই। ওপারের কোনো আওয়ায শোনার মতো কান আমাদের নেই এবং এমন কোনো উপকরণও আমাদের কাছে নেই, যার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা জানা যেতে পারে। বিজ্ঞানের যতটুকু ক্ষেত্র, এ প্রশ্ন তার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের নামে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে, সে নিশ্চিতরূপে অবৈজ্ঞানিক কথা বলে। মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে—বিজ্ঞানের সহায়তায় একথা যেমন বলা যায় না ; তেমনি তা নেই বলে ঘোষণা করা চলে না, যে পর্যন্ত না এতদসম্পর্কিত জ্ঞান লাভের কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র আবিষ্কৃত হয়। অন্ততঃপক্ষে তদ্বিধ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একমাত্র এটাই হতে পারে যে, আমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করবো না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্যকরী ?—মোটেই নয়। বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে কোনো একটা জিনিস সম্বন্ধে অবগত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত 'না' অথবা 'হাঁ' সূচক কোনো সিদ্ধান্ত থেকে দূরে থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কোনো জিনিসের সাথে যখন আমাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করা ছাড়া কোনোই উপায় থাকে না, তখন তা অবশ্যই করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছুই অবগত নন এবং তার সাথে আপনার কোনো কাজ-কারবার করারও ইতিপূর্বে প্রয়োজন হয়নি। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির সাথে যদি আপনার কোনো কাজ-কারবার করতে হয়, তাহলে তাকে হয়তো বিশ্বাসযোগ্য কিংবা বিশ্বাস-অযোগ্য মনে করে নিতে আপনি বাধ্য হন। আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে, বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে সন্দিগ্ধ অবস্থায় কারবার করবো। কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনে আপনি যে কারবার তার সাথে করবেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তার ধরন অবিশ্বাস্য ব্যক্তির মতোই হবে। অতএব প্রকৃতপক্ষে স্বীকার ও অস্বীকার মধ্যবর্তী সন্দিগ্ধ

অবস্থায় স্থিরিকৃত হতে পারে না। এর জন্য তো সুস্পষ্ট স্বীকার কিংবা চূড়ান্ত অস্বীকারই অপরিহার্য।

সামান্য মনোনিবেশ ও গবেষণা দ্বারাই এটা আপনার বোধগম্য হবে যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কীত প্রশ্নটি মাত্র একটি দার্শনিক প্রশ্নই নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদি আমার এ ধারণা থাকে যে, জীবনের সবকিছু এ পার্থিব জীবন পর্যন্তই শেষ এবং এরপর অপর কোনো জীবন নেই, তাহলে আমার নৈতিক ব্যবহার এক ধরনের হবে। আর যদি আমার ধারণা থাকে যে, এরপর আরও একটি জীবন আছে—যাতে আমার বর্তমান জীবনের হিসাব প্রদান করতে হবে এবং আমার এ জীবনের কার্যকলাপের ভিত্তিতেই সেখানে ভালো কিংবা মন্দ ফল গ্রহণ করতে হবে ; তাহলে নিশ্চয়ই আমার নৈতিক কার্যপদ্ধতি পূর্বোক্ত ধরনের জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন ঃ যেমন এক ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে ভ্রমণ করছে যে, তাকে এখান থেকে করাচী পর্যন্ত যেতে হবে এবং করাচী পৌছার পর এ ভ্রমণের শুধু চির সমাপ্তিই ঘটবে না, বরং সে সেখানে পুলিশ-আদালত এবং সওয়াল-জওয়াব করার অধিকারী সকল শক্তির নাগালের বাইরে চলে যাবে।

পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি এ ধারণা রাখে যে, এখান থেকে করাচী পর্যন্ত তার সফরের প্রথম মনজিল। এরপর তাকে সমুদ্রের পরপারে এমন এক দেশে যেতে হবে, যে দেশের বাদশাহই এ দেশের বাদশাহ এবং তাঁর অফিসে এ ব্যক্তি এ দেশে যা করেছে তৎসম্পর্কিত সম্পূর্ণ গুপ্ত রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। তার কৃতকর্ম অনুসারে কোন্ ধরনের ব্যবহার তার সাথে করা যেতে পারে, তা উক্ত রেকর্ড পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ দুই ব্যক্তির কার্যপদ্ধতিতে কি পরিমাণ পার্থক্য থাকবে, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। প্রথম ব্যক্তি এখান থেকে করাচী পর্যন্ত সফরের উপযোগী পাথেয় সংগৃহীত করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তির পাথেয় সংগৃহীত হবে পরবর্তী দীর্ঘ সফরের জন্যও। প্রথম ব্যক্তি মনে করবে—লাভ-লোকসান যা কিছু হবার তা পৌছা পর্যন্তই, এরপর আর কিছুই নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করবে যে, প্রকৃত লাভ-লোকসান সফরের প্রথম মনজিলে নয় বরং সর্বশেষ মনজিলেই দেখা দিবে।

প্রথম ব্যক্তি নিজের কার্যকলাপের সেই সমস্ত ফলাফলের প্রতিই নজর রাখবে যা করাচী পৌছা পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ সেই সমস্ত ফলাফলের প্রতি থাকবে, যা সমুদ্রের অপর পার্শ্বস্থ

দেশে পৌঁছার পর প্রকাশিত হতে পারে। এ দুই ব্যক্তির কার্যপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ভ্রমণ সম্পর্কে তাদের ধারণা পার্থক্যেরই যে ফল তা সুস্পষ্ট। ঠিক এভাবেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত ধারণা আমাদের বাস্তব জীবনের ধারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে থাকে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করতে হলেই উক্ত পদক্ষেপের প্রকৃতি নিরূপণ এ প্রশ্নেরই উপর নির্ভরশীল যে, এ জীবনকেই প্রথম ও শেষ জীবন মনে করে কাজ করা হচ্ছে, অথচ পরবর্তী কোনো জীবন ও তার ফলাফলের প্রতিও আস্থা আছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় আমাদের পদক্ষেপ এক প্রকৃতির হবে এবং শেষোক্ত অবস্থায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নটা নিছক খেয়ালী দার্শনিক প্রশ্ন নয় ; বরং বাস্তব জীবনেরই প্রশ্ন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সন্দিগ্ধ ও দোদুল্যমান মনোভাব গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সন্দিগ্ধ অবস্থায় জীবন যাপনের যে পদ্ধতিই আমরা অবলম্বন করবো, তা অস্বীকারকারীর জীবন পদ্ধতির মতোই হবে। ফল কথা মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জীবন আছে কিনা, এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। বিজ্ঞান যদি আমাদেরকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে অক্ষম হয়, তবে আমাদেরকে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

এখন বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করার জন্য আমাদের কাছে কি উপকরণ আছে তাই আমরা সর্বপ্রথম যাচাই করে দেখবো।

আমাদের সামনে প্রথম উপকরণ হচ্ছে স্বয়ং মানুষ এবং দ্বিতীয় উপকরণ হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি। আমরা মানুষকে এ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থলে রেখে বিচার করে দেখবো যে, মানুষ হিসেবে তার সমস্ত দাবী-দাওয়া সৃষ্টির বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থায় মিটে যাচ্ছে, না কোনো দাবী অপূর্ণ থাকছে বলে তার জন্য একটি ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের দেহটিই বিচার করে দেখুন তা বহু খনিজ পদার্থ—লবণ, পানি এবং গ্যাসের সমষ্টি। এর সাথে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি জগতে মাটি, পাথর, লবণ, গ্যাস এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিস বিদ্যমান। এ সমস্ত জিনিসের স্ব স্ব কাজ করার জন্য বিধানের প্রয়োজন। উক্ত বিধান সৃষ্টি জগতের সর্বত্রই সক্রিয় এবং তা বাইরের পরিবেশে পাহাড়, নদী ও বায়ুকে যেমন স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের পূর্ণ সুবিধা দিয়ে থাকে, তেমনি মানুষের দেহও ঐ বিধানের অধীন কাজ করার অধিকার পায়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের দেহ চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যসমূহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বর্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এ ধরনেরই বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঘাস ইত্যাদি সমষ্টিসমূহের মধ্যেও বর্ধনশীল দেহধারীদের প্রয়োজনীয় বিধানের অস্তিত্ব দেখা যায়।

তৃতীয়ত, মানুষের দেহ জীবন্ত ও স্বেচ্ছায় নড়া-চড়া করে, নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে, নিজের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেই করে থাকে এবং নিজের বংশ বিস্তারেরও ব্যবস্থা করে থাকে। সৃষ্টিজগতে এ ধরনেরও বিভিন্ন জীবন বিদ্যমান রয়েছে। জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলে এমন অসংখ্য জীব-জন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের সামগ্রিক জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত থাকার উপযোগী বিধানও ঐ সমস্ত জীবন্ত অস্তিত্বের উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল।

এসবের উর্ধে অন্য ধরনের আরও একটি সত্ত্বা মানুষের আছে, যাকে আমরা নৈতিক জীবন বলে অভিহিত করি। তার মধ্যে ভালো ও মন্দ কাজ করার অনুভূতি আছে। ভালো মন্দের পার্থক্যবোধ আছে, ভালো কিংবা মন্দ কাজ অনুসন্ধান করার শক্তি আছে এবং কৃতকর্মের ভালো কিংবা মন্দ ফল প্রকাশ্যভাবে লাভ করার একটি প্রকৃতিগত বাসনাও তার মধ্যে বিরাজ করছে। যুলুম, ইনসাফ, সত্যবাদিতা ও মিথ্যা, হক ও না-হক, দয়াশীলতা ও নির্মমতা, কৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা, দানশীলতা-কার্পণ্য ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শ্রেণীর নৈতিক গুণাগুণসমূহের মধ্যেও মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পার্থক্য করে থাকে। এসব গুণ কাল্পনিক নয়, বরং মানুষের বাস্তব জীবনে এটা ক্রিয়াশীলরূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং কার্যত এদের প্রভাব মানুষের তামাদ্দুনিক জীবনে প্রকাশিত হয়। অতএব মানুষ জাতি স্বভাবতই দৈহিক কাজের ফলাফলের ন্যায় নৈতিক কাজের ফলাফল লাভ করার প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভব করে।

কিন্তু সৃষ্টিজগতের পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন, মানুষের নৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল পূর্ণরূপে এখানে প্রকাশিত হতে পারেনি ? আমি আপনাদেরকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে জ্ঞাপন করছি যে, এখানে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কেননা আমাদের জানা মতে নৈতিক জীবনের অধিকারী অপর কোনো সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। সারাটি বিশ্ব প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। নৈতিক বিধান এর কোনো অংশেই কার্যকরীরূপে দৃষ্ট হচ্ছে না। এখানে টাকার ওজন এবং মূল্য দুই-ই আছে, কিন্তু সত্যকে ওজন করা যায় না—তার মূল্যও নির্ধারণ করা চলে না। এখানে আমের বীজ থেকে সর্বদা আম বৃক্ষ

অংকুরিত হয়। কিন্তু সত্যের বীজ বপনকারীদের প্রতি কখনও পুষ্প বৃষ্টি, আর কখনও জুতা বর্ষণ হয়ে থাকে। এখানে দৈহিক অস্তিত্বসম্পন্নদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান আছে এবং সেই বিধানানুযায়ী সর্বদা ফলাফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু নৈতিক কার্যসমূহের জন্য এমন কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই যাতে ফলাফল সর্বদা একই ধরনের হতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলার দরুন নৈতিক ফলাফল কখনও পাওয়া যাবে, যতটুকু প্রাকৃতিক বিধানের অধীন সম্ভব। কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, কোনো একটি নৈতিক কাজ এর স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ একটি বিশেষ ফলের সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিধানের সংমিশ্রণে এর ফল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হয়ে যায়। মানুষ নিজেই তাদের তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপসমূহের এক বাঁধাধরা ফল প্রাপ্তির যৎসামান্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ চেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং বিরাট ত্রুটিপূর্ণ। একদিকে প্রাকৃতিক বিধান এ চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে এবং অপরদিকে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাসমূহ এ ত্রুটিকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

আমি আমার বক্তব্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিষ্কার করতে চাই। এক ব্যক্তি যদি অন্য এক ব্যক্তির শত্রুতা করে এবং তার ঘরে অগ্নিসংযোগ করে, তবে তার ঘর জ্বলে যাবে, এটা এ কাজের প্রাকৃতিক পরিণতি। এর নৈতিক ফল স্বরূপ অগ্নি সংযোগকারীর সেই পরিমাণ শাস্তি পাওয়া উচিত, যে পরিমাণ ক্ষতি উক্ত পরিবারটির হয়েছে। কিন্তু এ ফল প্রকাশিত হওয়া কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। যথা অগ্নি সংযোগকারীর সন্ধান পাওয়া, তাকে গ্রেফতার করতে পুলিশের সক্ষম হওয়া, তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া, আদালতের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও তাদের পরবর্তী বংশধরদের ক্ষতির সঠিক হিসাব নির্ধারণ সম্ভব হওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাকে ঠিক পরিমাণ মতো দণ্ড দান করা। এ সমস্ত শর্তের কোনো একটিও পূরণ না হলে হয় নৈতিক ফল আদৌ প্রকাশিত হবে না ; আর না হয় তা খুবই সামান্য প্রকাশিত হবে। এমনও হবার সম্ভাবনা আছে যে, নিজের শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করে সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে পরম সুখে বর্ধিত ও প্রতিপালিত হতে থাকবে।

এটা থেকেও একটি বড় ধরনের উদাহরণ নেয়া যাক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিজেদের জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে এবং সমগ্র জাতি তাদের নির্দেশানুসারে চলতে থাকে। এ অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে তারা জনমনে উৎকট জাতিপূজার রোগ ও সাম্রাজ্যবাদের তীব্র

আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের সাথে যুদ্ধ বাঁধায়। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। সমগ্র দেশ ধ্বংসের কবলে পতিত হয় এবং এর প্রভাব পরবর্তী কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ মুষ্টিমেয় লোক যে বিরাট অপরাধে অপরাধী তার যথাযোগ্য ও ন্যায়সংগত শাস্তি এ পার্থিব জীবনে তারা পাবে বলে মনে করা যায় কি ? যদি তাদের দেহের গোশতসমূহ চেঁছে ফেলা যায় কিংবা জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়। অথবা মানুষের সাধ্যানুযায়ী অন্য কোনো কঠিনতম শাস্তিও দেয়া হয়, তথাপি কোটি কোটি মানুষ এবং তাদের বংশধরদের যে অনিষ্ট সাধন তারা করেছে তার তুলনায় প্রদত্ত শাস্তি অতি নগণ্যই হবে। বস্তুত বর্তমান জগত যে প্রাকৃতিক বিধানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এতে উপরোক্ত অপরাধের যোগ্য শাস্তিদানের কোনোই উপায় নেই।

পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত লোকের কথাও চিন্তা করুন, যারা মানব গোষ্ঠীকে সত্য এবং ন্যায়ের শিক্ষাদান করেছেন, জীবন যাপনের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শন করেছেন, যাদের দানে অসংখ্য মানুষ পুরুষানুক্রমে কল্যাণ লাভ করে আসছে এবং আরও পরবর্তী কত শতাব্দী পর্যন্ত লাভ করবে তার ইয়ত্তা নেই। এ মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল কি এ পার্থিব জীবনে লাভ করতে পারবে ? আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের অধীন এক ব্যক্তি তার এমন সমস্ত কাজের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করতে পারে—যার প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পরও শত সহস্র বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং অসংখ্য মানুষকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রথমত বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থা যে বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাতে মানুষের নৈতিক কার্যকলাপের পূর্ণ ফল লাভ করার কোনোই অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত এখানকার স্বল্পকালীন জীবনে মানুষ যে সমস্ত কাজ করে থাকে তার প্রতিফল এতো সুদূর প্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী যে, তা সঠিকভাবে ভোগ করার জন্য তার হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ বছর দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের অধীন মানুষের এতো দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব নয়। এ আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানব সত্ত্বার মৃত্তিক আংগিক ও জৈবিক উপাদানসমূহের জন্য বর্তমান প্রাকৃতিক বিশ্বের স্বাভাবিক বিধানসমূহই যথেষ্ট ; কিন্তু নৈতিক দিকের জন্য এ দুনিয়ার জীবন মোটেই যথেষ্ট নয়। এর জন্য এমন একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যেখানে নৈতিক বিধনাই হবে প্রভাবশীল ও ভিত্তিগত বিধান এবং প্রাকৃতিক বিধান এর অধীনে থেকে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

সেখানে জীবন সীমাবদ্ধ না হয়ে অসীম হবে এবং এখানে অপ্রকাশিত বা বিপরীত রূপ প্রকাশিত যাবতীয় নৈতিক ফলাফল সেখানে ঠিকভাবে প্রকাশিত হবে। সেখানে সোনা ও রূপার স্থলে সততা ও সত্যবাদিতার মূল্য ওজন হবে। সেখানে অগ্নি শুধু তাকেই দগ্ধ করবে, নৈতিক কারণে যার দগ্ধ হওয়া উচিত। সেই স্থান সৎলোকদের জন্য সুখময় এবং অসৎলোকদের জন্য দুঃখময় হবে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতি নিঃসন্দেহে এ ধরনের একটি জগত ব্যবস্থার দাবী করে।

বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে 'হওয়া উচিত' পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করে। এখন প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোনো জগত আছে কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা উভয়ই কোনো চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে সমর্থ নয়। এ ব্যাপারে একমাত্র পবিত্র কুরআনই আমাদের সাহায্য করে। তার ঘোষণা এই যে, তোমাদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃতি যে জিনিসের দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে হবেও তাই। বর্তমান প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত জগত একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং এক ভিন্ন ধরনের জগত ব্যবস্থা স্থাপিত হবে—যার অধীন আসমান-যমীন এবং সকল জিনিসই ভিন্নরূপ ধারণ করবে।

অতপর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে জন্ম লাভ করেছে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং একই সময় সকলকে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করা হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জীব এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর পূর্ণ কার্যকলাপের রেকর্ড ভুল-ত্রুটি বিহীন অবস্থায় পেশ করা হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজে যা এবং যতটুকু প্রতিক্রিয়া এ দুনিয়াতে দেখা দিয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণী মওজুদ থাকবে। এসব কার্যকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল-ই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হবে। মানুষের কথা এবং কাজ দ্বারা যাদের উপর সামান্যতম আঁচড়ও লেগেছে, তারাও স্ব স্ব তালিকা পেশ করবে। মানুষ তার নিজের হাত, পা, চোখ ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগকে কোন্ ধরনের কাজে ব্যবহার করেছিলো এরা তার সাক্ষ্য দান করবে। অপতর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এক কার্যবিবরণীর প্রতি পূর্ণ ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টি রেখে তাঁর রায় দান করবেন। তাতে কে কি পরিমাণ পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তার ঘোষণা করবেন। এ পুরস্কার বা শাস্তির ব্যপ্তি এতো বিশাল হবে যে, বর্তমান সীমাবদ্ধ দুনিয়ার মাপকাঠি অনুসারে তার অনুমান করা অসম্ভব। সেখানে সময় ও স্থানের মাপকাঠি

ভিন্ন ধরনের এবং প্রাকৃতিক বিধানও অন্য প্রকারের হবে। এখানে যাদের কৃত সৎকর্মসমূহ থেকে অন্যান্য মানুষ হাজার হাজার বছর পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করেছে, সেখানে তারা তার পূর্ণ ফল ভোগ করার সুযোগ পাবে, মৃত্যু রোগ এবং বার্ধক্য তাদের সুখ হরণ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যাদের দুষ্কর্মের দরুন এ দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ শত-সহস্র বছর যাবত যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তারাও সেখানে কৃত অপরাধের শাস্তি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে। মৃত্যু কিংবা সংজ্ঞাহীনতা তাদেরকে শাস্তি ভোগ করা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এমন এক জীবন ও জগতের সম্ভাবনা যারা অস্বীকার করে তাদের চিন্তাশক্তির সংকীর্ণতার জন্য আমার দুঃখ হয়। যদি আমাদের বর্তমান বিশ্বের পক্ষে বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান সহকারে আমাদের সামনে মওজুদ থাকা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে এরপরে অপর একটি জগত অন্য ধরনের বিধান সহকারে অস্তিত্বশীল হওয়া অসম্ভব হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানের জন্য কোনো বাস্তব প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। তার জন্য গায়েবের (অদৃশ্য) প্রতি বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক।

সমাপ্ত